পথ-মোচন

অনেক সময় দেখা যায় যে প্রশ্ন সহজ হওয়ায় পরীক্ষার্থীরা ফেল্ করিতে থাকে। এক-একটি সহজ বিষয়ও নানা প্রকার কল্পিত রূপক অর্থের আবরণে চাপা পড়িয়া যায়, নিতান্ত সহজ কথা আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার আতিশয্যে ঝাপ্‌সা বলিয়া মনে হইতে থাকে। রবীন্দ্রনাথের লেখা সম্বন্ধেও দেখা যায় যে একটি বিশেষ তত্ত্ব-কথা বা একটি বিশেষ রূপক অর্থ আবিষ্কার করিবার ঝোঁকে অনেক সময়ে লোকে মূল বিষয়টিকে ভুলিয়া যায়, আসল কথাটি সহজ বলিয়াই লোকে ভুল বুঝে। "মুক্তধারা" নাটকখানি সম্বন্ধেও এইরূপ ঘটিবার সম্ভাবনা আছে, সেইজন্য গোড়াতেই "মুক্তধারার" সহজ অর্থটিকে সহজ ভাবে বুঝিয়া লইবার চেষ্টা করা দর্‌কার।

(১)

নাটকখানির সম্মুখে সমস্ত মঞ্চ জুড়িয়া পড়িয়া রহিয়াছে নানা মানুষের চলাচলের পথ; দূরে আকাশে একটা অভ্রভেদী লৌহযন্ত্রের মাথা অসুরের মত হাঁ করিয়া রহিয়াছে, অপর দিকে ভৈরব-মন্দির-চূড়ার ত্রিশূল; পিছনে বাঁধন-বাঁধা "মুক্তধারা", জলের শব্দ আসিয়া পৌঁছিতেছে কিনা স্পষ্ট বুঝা যায় না; মাঝে মাঝে ভৈরব-মন্ত্র শুনা যাইতেছে—

জয় ভৈরব, জয় শঙ্কর,
জয় জয় জয় প্রলয়ঙ্কর,
শঙ্কর শঙ্কর।

আর এই সমস্তের মাঝখানে রহিয়াছেন উত্তরকূটের যুবরাজ অভিজিৎ।

অভিজিতের জন্ম রাজ-বাড়িতে হয় নাই মুক্তধারা ঝর্‌ণা-তলা হইতে তাঁহাকে কুড়াইয়া পাওয়া গিয়াছিল; তাঁহার কপালে রাজচক্রবর্ত্তীর চিহ্ন দেখিয়া তাঁহাকে যুবরাজ করা হইয়াছে। অভিজিৎ এ খবর জানিতেন না, তবুও ঝর্‌ণার শব্দে পথের সুরে তাঁহার মন উতলা হইয়া উঠিত। গৌরীশিখরের দিকে তাকাইয়া যুবরাজ ভাবিতেন—"যে-সব পথ এখনো কাটা হয়নি ঐ দুর্গম

পাহাড়ের উপর দিয়ে সেই ভাবী কালের পথ দেখ্‌তে পাচ্চি—দূরকে নিকট কর্‌বার পথ।"

একদিন যুবরাজ শুনিলেন যে মুক্তধারার উৎসের নিকটে কোন্ ঘরছাড়া মা তাঁহাকে জন্ম দিয়াছে। অভিজিৎ বুঝিলেন যে তাঁহার জন্মক্ষণে গিরিরাজ তাঁহাকে পথে অভ্যর্থনা করিয়াছেন, ঘরের শঙ্খ তাঁহাকে ঘরে ডাকে নাই। ইহার পর হইতে যুবরাজকে অনেক সময়েই আর রাজবাড়িতে দেখা যাইত না, তিনি রাজবাড়ি ছাড়িয়া ঝর্‌ণাতলায় চলিয়া যাইতেন। জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন—"ঐ জলের শব্দে আমি আমার মাতৃভাষা শুন্‌তে পাই", বলিতেন—"আমি পৃথিবীতে এসেচি পথ কাট্‌বার জন্যে, এই খবর আমার কাছে এসে পৌঁছেচে।"

যুবরাজকে তখন শিবতরাইয়ের শাসনভার অর্পণ করিয়া মুক্তধারার নিকট হইতে দূরে পাঠাইয়া দেওয়া হইল। অভিজিৎ কিন্তু মুক্তধারার মাতৃভাষা ভুলিতে পারিলেন না। শিবতরাইয়ের অন্নচলাচলের পথ বন্ধ করিবার জন্য অনেকদিন হইল নন্দিসঙ্কটে গড় গাঁথিয়া তোলা হইয়াছিল, অভিজিৎ এই বহু-দিনের পুরাতন গড় ভাঙিয়া নন্দিসঙ্কটের পথ খুলিয়া দিলেন। উত্তরকূটের স্বার্থে আঘাত লাগায় উত্তরকূটের অধিবাসীরা উত্তেজিত হইয়া উঠিল, যুবরাজ অভিজিৎকে উত্তরকূটে ফিরিয়া আসিতে হইল।

অভিজিৎ উত্তরকূটে ফিরিয়া আসিয়া প্রথমেই দেখিলেন মুক্তধারার বাঁধ বাঁধা হইয়া গিয়াছে। শিবতরাইয়ের প্রজাদের কিছুতেই বাধ্য করা যায় নাই। এতদিন পরে যন্ত্ররাজ বিভূতি মুক্তধারার জলকে আয়ত্ত করিয়া তাহাদিগকে বশ মানাইবার উপায় করিয়া দিয়াছে, শিবতরাইয়ের প্রজাদের পিপাসার জল এইবার বন্ধ করা চলিবে, শিবতরাইয়ে দুর্ভিক্ষ আসন্নপ্রায়। এই অসামান্য কীর্তিকে পুরস্কৃত করিবার উপলক্ষ্যে উত্তরকূটের সমস্ত লোক উৎসব করিতেছে। যন্ত্ররাজ বিভূতির প্রশংসায়, যন্ত্র-মহিমা-জয়গানে সমস্ত নগরী মুখরিত।

কিন্তু এই বাঁধ ত সহজে বাঁধা হয় নাই। বাঁধ বারবার ভাঙিয়া পড়িয়াছে, কত লোক ধূলাবালি চাপা পড়িয়াছে, কতলোক বন্যায় ভাসিয়া গিয়াছে। উত্তরকূটে যখন মজুর পাওয়া যায় নাই তখন রাজার আদেশে প্রত্যেক ঘর হইতে আঠারো বৎসরের উপর বয়সের যুবককে জোর করিয়া ধরিয়া আনা হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে অনেকেই ফিরে নাই। সেখানকার কত মায়ের অভিশাপের উপর যন্ত্র-শক্তি জয়ী হইয়াছে। মায়ের ক্রন্দন কিন্তু থামে

নাই। জয়োৎসবের মধ্যেও শুনা যাইতেছে, জনাই গ্রামের অম্বা কাঁদিয়া বেড়াইতেছে—"সুমন! আমার সুমন! বাবা আমার সুমন এখনো ফিরল না!·····তাকে যে কোথায় নিয়ে গেল। আমি ভৈরবমন্দিরে পুজো দিতে গিয়েছিলুম—ফিরে এসে দেখি তাকে নিয়ে গেচে। বাবা সুমন! সূর্য্য ত অস্ত যায়—আমার সুমন'ত এখনো ফিরল না!"

উস্কোখুস্কো-চুল হাতে বাঁকা ডালের লাঠি পাগল বটুক সকলকে ডাকিয়া বলিতেছে—"সাবধান, বাবা, সাবধান। যেয়ো না ও পথে, সময় থাকতে ফিরে যাও। ·····বলি দেবে, নরবলি। আমার দুই জোয়ান নাতিকে জোর করে নিয়ে গেল, আর তারা ফিরল না·· ···সাবধান, বাবা সাবধান, যেওনা ও পথে।"

একদিকে নাগরিকদিগের উৎসবকোলাহল, অপর দিকে মায়ের ক্রন্দন, পাগলের অভিশাপ, তার মাঝে থাকিয়া থাকিয়া ধ্বনিত হইতেছে—

তিমির-হৃদ্‌বিদারণ
জ্বলদগ্নি-নিদারুণ,
মরু-শ্মশান-সঞ্চর,
শঙ্কর শঙ্কর!

যুবরাজ ফিরিয়া আসিয়া এ সমস্তই দেখিলেন। পাগল বটুক আসিয়া তাঁহাকে খবর দিল—"জান না, যুবরাজ? ওরা যে আজ যন্ত্রবেদীর উপর তৃষ্ণারাক্ষসীর প্রতিষ্ঠা করবে। মানুষ বলি চায়।" অম্বা আসিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল—"সুমন! বাবা সুমন! যে পথ দিয়ে তাকে নিয়ে গেল সে পথ দিয়ে তোমরা কি কেউ যাওনি?"

যুবরাজ বুঝিলেন যে রাজপ্রাসাদের শাসন-নীতির সহিত তাঁহার জীবনের কোন সত্য মিলন ঘটা সম্ভবপর নহে। মুক্তধারার উৎসের নিকট তাঁহার জন্ম, পথ খুলিয়া দিবার আহ্বানটিকে তাঁহার অন্তরতম চৈতন্যের মধ্যে ধারণ করিয়া তিনি জয়লাভ করিয়াছেন, তাই অভিজিৎ স্পষ্ট বুঝিলেন যে রাজগৃহে তাঁহার স্থান নাই। ভাই-বোনের সম্বন্ধের ন্যায় অভিজিতের সহিত মুক্ত-ধারার যোগ ভিতরে বাহিরে; এই ভিতরকার যোগের পরিচয় তিনি বাহিরের ঘটনার মধ্যেও দেখিতে পাইলেন, সেইজন্যই মুক্ত-ধারার বাঁধ-বাঁধার বেদনা অভিজিৎকে এমন কঠিনভাবে আঘাত করিল। অভিজিতের মনে হইল—"মানুষের ভিতরের রহস্য বিধাতা বাহিরের কোথাও না কোথাও

লিখে রেখেছেন ; আমার অন্তরের কথা আছে ঐ মুক্তধারার মধ্যে। তারই পায়ে ওরা যখন লোহার বেড়ি পরিয়ে দিলে তখন হঠাৎ যেন চমক ভেঙে বুঝ্‌তে পার্‌লুম উত্তরকূটের সিংহাসনই আমার জীবনস্রোতের বাঁধ। পথে বেরিয়েচি তারই পথ খুলে দেবার জন্যে।" অভিজিৎ রাজকুমার সঞ্জয়কে বলিলেন—"আমার জীবনের স্রোত রাজবাড়ির পাথর ডিঙিয়ে চলে' যাবে এই কথাটা কানে নিয়েই পৃথিবীতে এসেচি।" অভিজিৎ বুঝিলেন প্রাণ দিয়াও মুক্তধারার বাঁধ তাঁহাকে ভাঙিতেই হইবে।

এমন সময় রাজাজ্ঞায় ধৃত হইয়া যুবরাজ কারাগারে বন্দী হইলেন। তখন সূর্য্য ডুবিতেছে, যন্ত্রের চূড়াটা সূর্য্যাস্তমেঘের বুক ফুঁড়িয়া উদ্যতমুষ্টি দানবের মত দাঁড়াইয়া রহিল, আর রহিল ভৈরব-ত্রিশূল।

উত্তরকূটের উৎসব চলিতে লাগিল। উত্তরকূটের অধিবাসীরা জয়-গর্বে উন্মত্ত, সপ্তাহ পরেই শিবতরাইয়ে চাষের ক্ষেত শুকাইয়া আসিবে। উত্তরকূটের পুরদেবতা এতদিন পরে প্রসন্ন হইয়াছেন, তৃষ্ণার শূলে বিদ্ধ করিয়া শিবতরাইকে এইবার তিনি উত্তরকূটের পদতলে ফেলিয়া দিবেন। উত্তরকূটের বালকদলও জানে যে উত্তরকূটের অধিবাসীরাই সকলের উপর জয়ী, তাহারাও জয়ধ্বনি করিতে লাগিল। শিবতরাইয়ের প্রজারা রাজার নিকট তাহাদের দুঃখের কথা জানাইতে আসিয়াছিল, উত্তরকূটের অধিবাসীরা তাহাদিগকেও জোর করিয়া টুঁটি টিপিয়া বলাইতে লাগিল—"জয় যন্ত্ররাজ বিভূতির জয়!" স্বেচ্ছায় ও অনিচ্ছায় উচ্চারিত জয়ধ্বনির মধ্যে মাঝে মাঝে শুনা গেল —

বজ্রঘোষ-বাণী
রুদ্র, শূলপাণি
মৃত্যুসিন্ধু-সন্তর
শঙ্কর, শঙ্কর!

ক্রমে সন্ধ্যা হইয়া আসিল, সূর্য্য অস্ত গিয়াছে, আকাশ অন্ধকার, কিন্তু রৌদ্রের মদ খাইয়া যন্ত্রের চূড়াটা তখনও লাল হইয়া জ্বলিতেছে, আর অস্তসূর্য্যের আলো স্পর্শ করিয়া রহিয়াছে ভৈরব-মন্দিরের ত্রিশূল।

এমন সময় বন্দীশালায় আগুন লাগিল। এই সুযোগে খুড়ামহারাজ বিশ্বজিৎ যুবরাজকে বন্দীশালা হইতে বাহির করিয়া আনিয়া বলিলেন—"তোমাকে বন্দী করতে এসেছি। মোহনগড়ে যেতে হবে।" অভিজিৎ জানেন যে এবার

সময় হইয়াছে, আর অপেক্ষা করা চলিবে না। তিনি বলিলেন—"আমাকে আজ কিছুতেই বন্দী কর্‌তে পার্‌বে না, না ক্রোধে, না স্নেহে। তোমরা ভাব্‌চ তোমরাই আগুন লাগিয়েচ? না, এ আগুন যেমন ক'রেই হোক্ লাগ্‌ত। আজ আমার বন্দী থাক্‌বার অবকাশ নেই।" অভিজিৎ বলিলেন,—"জন্মকালের ঋণ শোধ কর্‌তে হবে। স্রোতের পথ আমার ধাত্রী, তার বন্ধন মোচন কর্‌ব।" এই বলিয়া অন্ধকারের মধ্যে অভিজিৎ চলিয়া গেলেন—

"কানে নিয়ে নিখিলের হাহাকার
শিরে নিয়ে উন্মত্ত দুর্দিন,
চিত্তে নিয়ে আশা অন্তহীন,
হে নির্ভীক, দুঃখ-অভিহত!"

বাউল গাহিল—

"ও ত আর ফির্‌বে না রে, ফির্‌বে না আর,
ফির্‌বে না রে!"

অমাবস্যার রাত্রি অন্ধকার হইয়া আসিল। যন্ত্রের চূড়াটা অন্ধকারে ভূতের মতন কালো দেখাইতেছে, কিন্তু ভৈরব-ত্রিশূল আর স্পষ্ট দেখা যায় না। যুবরাজ বন্দীশালায় নাই শুনিয়া উত্তরকূটের অধিবাসীরা ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে; যুবরাজকে তাহারা রাত্রির অন্ধকার পথে পথে খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিল। নন্দিসঙ্কটের ভাঙা গড় নূতন করিয়া গাঁথিয়া তুলিবার ষড়যন্ত্র চলিতেছে, যন্ত্ররাজ বিভূতির দলবল রাত্রির অন্ধকারে গোপনে শিবতরাইএ যাত্রা করিয়াছে, পথে যাহাকে পায় জোর করিয়া ধরিয়া লইয়া চলিল। শিবতরাইয়ের প্রজারাও পথে বাহির হইয়াছে যুবরাজকে খুঁজিবার জন্য।

মশাল নিবিয়া গিয়াছে, বাতি জ্বলিতেছে না, রাত্রির অন্ধকারে দলে দলে লোক পথে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, কেহ কাহাকেও চিনিতে পারে না, কে কোন্ দিকে চলিয়াছে ঠাহর পায় না, শুধু যন্ত্রের চূড়াটা তখনও যেন ইসারা করিতেছে।

অন্ধকারে বৃদ্ধ বটুক ডাকিতেছে—"জাগো, ভৈরব জাগো!" অম্বা পথে পথে কাঁদিয়া ফিরিতেছে—"সুমন! বাবা সুমন! অন্ধকার হয়ে এল, সব অন্ধকার হয়ে এল!" বৈরাগী গান ধরিলেন—

প্রহর জাগে প্রহরী জাগে,
তারায় তারায় কাঁপন লাগে।

অন্ধকারে আবার শোনা গেল অথার ক্রন্দন—"মা ডাকে! মা ডাকে! ফিরে আয়, সুমন, ফিরে আয়!" এমন সময় ভৈরবের ডমরু বাজিয়া উঠিল। হঠাৎ শোনা গেল মুক্ত-ধারার বাঁধন-ভাঙা জলোচ্ছ্বাস। বৈরাগী গাহিলেন—

বাজে রে বাজে ডমরু বাজে
হৃদয় মাঝে হৃদয় মাঝে।

কুমার সঞ্জয় আসিয়া খবর দিলেন যে যুবরাজ অভিজিৎ মুক্তধারার বাঁধ ভাঙিয়াছেন, কিন্তু যন্ত্রাসুরও তাঁহাকে আঘাত ফিরাইয়া দিল, মুক্তধারা অভিজিতের আহত দেহকে কোলে তুলিয়া চলিয়া গিয়াছে।

অন্ধকারে জলস্রোতের শব্দ শোনা যাইতে লাগিল আর বাজিতে লাগিল ভৈরব-মন্ত্র—

জয় ভৈরব, জয় শঙ্কর
জয় জয় জয় প্রলয়ঙ্কর।
জয় সংশয়-ভেদন,
জয় বন্ধন-ছেদন,
জয় সংকট-সংহর
শঙ্কর শঙ্কর!

(২)

যুবরাজ অভিজিৎ ছিলেন সকলেরই প্রিয় উত্তরকূটের অধিবাসীরা তাঁহাকে সত্যই ভালবাসিত, উত্তরকূটের মেয়েরাও জানে যে "উনি ত সবারই হৃদয় জয় ক'রে নিয়েছেন।" অথচ অভিজিৎকে নিজের দেশের লোকের বিরুদ্ধেই সংগ্রাম করিতে হইয়াছে। মহারাজ রণজিৎ দুঃখ করিয়াছেন—"এ-যে নিজের লোকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ।" যুবরাজ অভিজিৎ যখন বাঁধ ভাঙ্গিবার প্রস্তাব করিয়া পাঠাইয়াছিলেন তখন যন্ত্ররাজ বিভূতিও এই আক্ষেপই করিয়াছেন—"স্বয়ং উত্তরকূটের যুবরাজ এমন কথা বলেন? তিনি কি আমাদেরই নন্? তিনি কি শিবতরাইয়ের?"

কিন্তু শুধু শিবতরাইয়ের দুঃখ দূর করিবার জন্য যুবরাজ প্রাণ দিয়াছেন বলিলে তাঁহার আত্মোৎসর্গকে ছোট করিয়া দেখা হইবে। এক হিসাবে শুধু অভিজিতের নহে, প্রত্যেক মানুষেরই জন্ম মুক্তধারা ঝর্ণাতলায় পথের ধারে।

মানুষ জন্মলাভ করে মুক্ত অবস্থায়, জন্মকালে তাহার কোন বন্ধন থাকে না, ক্রমে সে নিজের বন্ধন নিজেই সৃষ্টি করে। প্রয়োজন সিদ্ধির উদ্দেশ্যে মানুষ নানাপ্রকার উপায় অবলম্বন করে, নানাপ্রকার ব্যবস্থার আয়োজন করে। কিন্তু উপায় যখন উদ্দেশ্যকে ছাড়াইয়া যায়, প্রয়োজন যখন আনন্দকে অতিক্রম করে, ব্যবস্থামাত্রই তখন যান্ত্রিক হইয়া উঠে। যান্ত্রিক-ব্যবস্থা জীবনের গতিকে অবরুদ্ধ করে, সমস্ত মানুষের চলাচলের পথ বন্ধ করিয়া দাঁড়ায়। যান্ত্রিক-বন্ধন শুধু যে আলাদা আলাদা করিয়া এক-একটি মানুষকে আঘাত করে তাহা নহে, সমস্ত মনুষ্যজাতিকে পীড়িত করিয়া তুলে। যেখানে বন্ধন সেইখানেই সমস্ত মানুষের বেদনা সঞ্চিত হইয়া উঠে। অভিজিতের মতন যে মানুষ নিজের জন্ম-কথার অর্থ জানিয়াছে সেই বুঝিতে পারে এই বেদনা কি দুঃসহ, এই বন্ধন কি বীভৎস!

মানুষের হাতে বিধাতা প্রচণ্ড শক্তি দিয়াছেন, বস্তু-পিণ্ডের দ্বারা, উপায় উপকরণ ব্যবস্থা আয়োজনের দ্বারা কাজ করাইয়া লইবার শক্তি মানুষের ব্রহ্মাস্ত্র। এই ক্ষমতা কল্যাণের পক্ষে প্রয়োগ করিলে মঙ্গল। কিন্তু স্বার্থ যখন প্রবল হইয়া উঠে, লোভ যখন দুর্বলকে হিংসা করে, জাতীয় অহমিকা যখন প্রচণ্ড হইয়া উঠে, মানুষ তখন নিজের অমোঘ ব্রহ্মাস্ত্র মানুষকে পীড়ন করিবার জন্য ব্যবহার করে, বিশ্বপাপ তখন বিকটমূর্তি ধারণ করে—

"ভীরুর ভীরুতাপুঞ্জ, প্রবলের উদ্ধত অন্যায়,
লোভীর নিষ্ঠুর লোভ,
বঞ্চিতের নিত্য চিত্ত-ক্ষোভ,
জাতি-অভিমান,
মানবের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার বহু অসম্মান,
বিধাতার বক্ষ আজি বিদীরিয়া,
ঝটিকার দীর্ঘশ্বাসে জলে স্থলে বেড়ায় ফিরিয়া!"

কিন্তু যান্ত্রিক-ব্যবস্থার বেদনা কোথায় গিয়া লাগে? যে অত্যাচার করে, যাহার হৃদয় কঠিন সে ত বেদনা অনুভব করে না। যে নিরপরাধ যে দুর্বল তাহাকেই বেদনা সহ্য করিতে হয়। কত মা পুত্রকে হারায়, কত স্ত্রী স্বামীকে হারায়, কত ভাই ভাইকে হারায়, কত নিরপরাধের সর্বনাশ হইয়া যায়। এইজন্যই ত পাপের আঘাত এমন নিষ্ঠুর। যেখানে পাপ, শাস্তি সেখানে আসে না। কিন্তু উপায় নাই, মানুষের সমাজে একজনের পাপের ফলভোগকে

অপর সকলকেই ভাগ করিয়া লইতে হয়, কারণ অতীতে ভবিষ্যতে দূরদূরান্তে হৃদয়ে হৃদয়ে পরস্পরের সহিত গ্রথিত হইয়া রহিয়াছে। মানুষের মধ্যে আসলে কোন বিচ্ছেদ নাই। সেইজন্য পিতার পাপ পুত্রকে বহন করিতে হয়, বন্ধুর পাপে বন্ধুকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়, প্রবলের উৎপীড়ন দুর্বলকে সহ্য করিতে হয়।

একথা বলিলে চলে না যে অন্যের কর্মফল আমি ভোগ করিব কেন। কবি বলিয়াছেন—"হাঁ, আমিই ভোগ কর্‌ব এই কথা ব'লে প্রস্তুত হও। নিজের জীবনকে শুচি কর, তপস্যা কর, দুঃখকে গ্রহণ কর! তোমার নিজের জীবনকে যদি পরিপূর্ণরূপে উৎসর্গ না কর তবে পৃথিবীর জীবনের ধারা নির্মল থাক্‌বে কেমন ক'রে, প্রাণবান্ হয়ে উঠ্‌বে কেমন ক'রে? ওরে তপস্বী, তপস্যায় প্রবৃত্ত হ'তে হবে—সমস্ত জীবনকে আহুতি দিতে হবে, তবেই যদ্‌ভদ্রং তৎ—যা ভদ্র তাই আসবে।"

যাহারা দুর্বল যাহারা অক্ষম তাহারা অত্যাচারিত হয়। এই অত্যাচার, এই অবিচার, অক্ষমের অপমান, ভীত ত্রস্ত দরিদ্রের বেদনার পরিহাস বড় নিদারুণ। কিন্তু এই দুঃখকে জয় করা যায়। শিবতরাইয়ের প্রজারা মার খাইয়াছিল, অবিচলিত সহ্যশক্তির দ্বারা ধনঞ্জয় বৈরাগী দেখাইলেন যে মারের উপরেও জয়ী হওয়া যায়। বৈরাগী ধৈর্য্যের দ্বারা দুঃখকে জয় করিতে শিখাইয়াছেন, এ শিক্ষা সত্য শিক্ষা। যাহারা দুর্বল, যাহারা অত্যাচারিত তাহাদের পক্ষে এ শিক্ষা শ্রেষ্ঠ শিক্ষা।

কিন্তু আরেক প্রকার দুঃখও আছে, সমস্ত মানুষের সুখদুঃখকে একত্র করিয়া যে একটি পরম বেদনা, পরম প্রেম রহিয়াছে তাহাও সত্য। সেইজন্যই এক জায়গার বেদনায় অপর জায়গায় আঘাত লাগে, পাপের বেদনায় সমস্ত বিশ্ব কাঁপিয়া উঠে, সমস্ত মানুষের প্রায়শ্চিত্ত সকল মানুষকেই করিতে হয়। যে হৃদয় প্রীতিতে কোমল, দুঃখের আগুন তাহাকেই প্রথম দগ্ধ করে। সমস্ত মানুষের বেদনাকে যে লোক হৃদয়ে অনুভব করিয়াছে সহ্যশক্তির দ্বারা শুধু দুঃখনিবৃত্তি করিয়া তাহার নিষ্কৃতি থাকে না—

"ছুটেছে সে নির্ভীক পরাণে
সঙ্কট-আবর্ত্তমাঝে, দিয়েছে সে বিশ্ব বিসর্জন
নির্য্যাতন লয়েছে সে বক্ষ পাতি ; মৃত্যুর গর্জন
শুনেছে সে সঙ্গীতের মত!·····

.....শুনিয়াছি তারি লাগি
রাজপুত্র পরিয়াছে ছিন্ন কন্থা, বিষয়ে বিরাগী
পথের ভিক্ষুক ! মহাপ্রাণ সহিয়াছে পলে পলে
সংসারের ক্ষুদ্র উৎপীড়ন, বিঁধিয়াছে পদতলে
প্রত্যহের কুশাঙ্কুর, করিয়াছে তারে অবিশ্বাস
মূঢ় বিজ্ঞজনে, প্রিয়জন করিয়াছে পরিহাস
অতিপরিচিত অবজ্ঞায়, গেছে সে করিয়া ক্ষমা
নীরবে করুণনেত্রে—অন্তরে বহিয়া নিরুপমা
সৌন্দর্য্য-প্রতিমা !"

উত্তরকূটের অধিবাসীরা স্বার্থের উত্তেজনায় কত মানুষকে পীড়া দিয়াছে। শিবতরাইয়ের প্রজারা দুঃখ পাইয়াছে, বটুক দুঃখ পাইয়াছে, সুমনের মা দুঃখ পাইয়াছে. এ সকল দুঃখ সামান্য নহে—কিন্তু এ সমস্ত দুঃখ ফিরিয়া আসিয়া আঘাত করিল সকলের প্রিয় বেদনায় সকরুণ নীরব নম্র মহাপ্রাণ যুবরাজ অভিজিৎকে।

যাহার চিত্ত-তন্ত্রীতে আঘাত করিলে সব চেয়ে বেশি বাজে তাহাকেই সমস্ত পৃথিবীর বেদনা অধিক করিয়া আঘাত করে। তাহার চক্ষে তন্দ্রা ছুটিয়া যায়, বেদনার আঘাতে বন্ধন খসিয়া পড়ে, দূরদিগন্তে সে শুনিতে পায় রুদ্রের ভৈরব-মন্ত্র তাহাকে আহ্বান করিতেছে।—

"তোমার পথের পরে তপ্ত রৌদ্র এনেছে আহ্বান
রুদ্রের ভৈরব গান।
দূর হ'তে দূরে
বাজে পথ শীর্ণ তীব্র দীর্ঘতান সুরে,
যেন পথ-হারা
কোন্ বৈরাগীর একতারা।"

সেইজন্যই, কুমার সঞ্জয় আসিয়া যখন মনে করাইয়া দিলেন "সকালে যে আসনে তুমি পূজায় বস, মনে আছে ত সে-দিন তার সাম্‌নে একটি শ্বেত পদ্ম দেখে তুমি অবাক হয়েছিলে ? তুমি জাগ্‌বার আগেই কোন ভোরে ঐ পদ্মটি লুকিয়ে কে তুলে এনেচে, জান্‌তে দেয় নি সে কে—কিন্তু ঐটুকুর মধ্যে কত সুধাই আছে সে কথা কি আজ মনে কর্‌বার নেই ? সেই ভীরু যে আপনাকে গোপন করেচে, কিন্তু আপনার পূজা গোপন কর্‌তে পারেনি, তার মুখ কি

তোমার মনে পড়্চে না?" যুবরাজ অভিজিৎ বলিলেন—"পড়্চে বই কি! সেইজন্যই ত সইতে পাচ্চিনে ঐ বীভৎসটাকে যা এই ধরণীর সঙ্গীত রোধ ক'রে দিয়ে আকাশে লোহার দাঁত মেলে হাস্য কর্চে। স্বর্গকে ভালো লেগেচে বলেই দৈত্যের সঙ্গে লড়াই কর্তে যেতে দ্বিধা করিনে।" সমস্ত মানুষের ক্রন্দন যুবরাজ শুনিয়াছেন, কে তাঁহাকে ঘরে ধরিয়া রাখিবে?

"না রে না রে হবে না তোর স্বর্গসাধন
সেখানে যে মধুর বেশে
ফাঁদ পেতে রয় সুখের বাঁধন।"

কুমার সঞ্জয় আসিয়া আবার বলিলেন—"যা কঠিন তার গৌরব থাক্‌তে পারে, কিন্তু যা মধুর তারও মূল্য আছে।" অভিজিৎ উত্তর করলেন—"ভাই, তারি মূল্য দেবার জন্যেই কঠিনের সাধনা। আমি কঠোরতার অভিমান রাখিনে।—চেয়ে দেখ ঐ পাখী দেবদারু-গাছের চূড়ার ডালটির উপর একলা বসে আছে; ও কি নীড়ে যাবে, না, অন্ধকারের ভিতর দিয়ে দূর প্রবাসের অরণ্যে যাত্রা কর্বে জানিনে; কিন্তু ও যে এই সূর্য্যাস্তের আকাশের দিকে চুপ ক'রে চেয়ে আছে সেই চেয়ে থাকার সুরটি আমার হৃদয়ে এসে বাজ্‌চে। সুন্দর এই পৃথিবী, যা-কিছু আমার জীবনকে মধুময় করেচে সে সমস্তকেই আজ আমি নমস্কার করি।....ঐ দেখ সঞ্জয়, গৌরীশিখরের উপর সূর্য্যাস্তের মূর্তি। কোন্ আগুনের পাখী মেঘের ডানা মেলে রাত্রির দিকে উড়ে চলেচে। আমার এই পথযাত্রার ছবি অস্তসূর্য্য আকাশে এঁকে দিলে।"

"ওরে যাত্রী
ধূসর পথের ধূলা সেই তোর ধাত্রী,
চলার অঞ্চলে তোর ঘূর্ণাপাকে বক্ষেতে আবরি'
ধরার বন্ধন হ'তে নিয়ে যাক্ হরি'
দিগন্তের পারে দিগন্তরে।
ঘরের মঙ্গল শঙ্খ নহে তোর তরে,
নহে রে সন্ধ্যার দীপালোক,
নহে প্রেয়সীর অশ্রু-চোখ।

বটুক যখন কাছে আসিয়া চুপে চুপে জিজ্ঞাসা করিল—"তবে শুনেচ বুঝি? ভৈরবের আহ্বান শুনেচ?" অভিজিৎ বলিলেন—"শুনেচি।" বটুক—

"সর্বনাশ! তবে ত তোমার নিষ্কৃতি নেই?" অভিজিৎ—"না, নেই।" বটুক—"সইতে পারবে কি যুবরাজ, যখন বক্ষ বিদীর্ণ হয়ে যাবে?" অভিজিৎ—"ভৈরবের প্রসাদে সইতে পারব।" বটুক—"চারিদিকে সবাই যখন শত্রু হবে? আপন লোকে ধিক্কার দেবে?" অভিজিৎ—"সইতেই হবে।" বটুক—"তা হলে ভয় নেই।" অভিজিৎ—"না, ভয় নেই।"

যুবরাজ অভিজিৎ জানিতেন যে রুদ্রের প্রসাদ তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছে।

"পথে পথে অপেক্ষিছে কালবৈশাখীর আশীর্বাদ,
শ্রাবণরাত্রির বজ্র-নাদ।
পথে পথে কণ্টকের অভ্যর্থনা
পথে পথে গুপ্ত সর্প গূঢ়ফণা!
নিন্দা দিবে জয়শঙ্খনাদ
এই তোর রুদ্রের প্রসাদ।"

যুবরাজ অভিজিৎ বেশি কথা বলেন নাই. কারণ তাঁহার মনে কোন দ্বিধা ছিল না। তিনি কাহাকেও ডাকেন নাই; কাহাকেও তিনি সঙ্গে লইলেন না। তিনি বুঝিয়াছিলেন—"আমার উপর যে কাজ পড়েচে সে একলা আমারই।"

কুমার সঞ্জয় অনুরোধ করিলেন—"যুবরাজ, আমাকেও তোমার সঙ্গী ক'রে নাও!" যুবরাজ সঞ্জয়কে কঠোর ভাবে বাধা দিয়াছেন—"না ভাই, নিজের পথ তোমাকে খুঁজে বের করতে হবে। আমার পিছনে যদি চল তাহলে আমিই তোমার পথ আড়াল করব।" কুমার সঞ্জয় যুবরাজকে ভালবাসিতেন; নিজের ভালবাসাকে চরিতার্থ করিবার জন্যই তিনি যুবরাজকে অনুসরণ করিতে চাহিলেন। যুবরাজ একথা বুঝিতে পারিয়াছিলেন, তিনি জানিতেন যে সঞ্জয়ের নিকট মুক্তধারার রহস্যের কোন অর্থ নাই, সঞ্জয়ের কানে মুক্তধারার আহ্বান পৌঁছায় নাই, তাই সঞ্জয়কে তিনি ঠেকাইয়া রাখিলেন। যুবরাজের কর্মের পুনরাবৃত্তিমাত্র করিয়া কোন ফল নাই, যুবরাজ যেমন নিজের পথে চলিয়াছেন সঞ্জয়কে সেই রকম নিজের পথ খুঁজিয়া চলিতে হইবে, যুবরাজের জীবনের ইহাই চরম শিক্ষা।

অভিজিৎ জানিতেন যে প্রত্যেক মানুষকেই নিজের পথ খুঁজিয়া চলিতে হইবে; এইজন্যই তিনি দল গড়িবার চেষ্টা করেন নাই। দলের মধ্যে নিজের পথ খুঁজিয়া পাওয়া শক্ত। যাহারা দলে ভিড়িয়া পড়ে তাহারা উপলব্ধি করিবার অবসর পায় না যে সত্যকে অন্তরে অনুভব করিয়াছে কি না। দশের ইচ্ছায় অভিভূত হইয়া বুঝিতে পারে না যে দলের আদর্শ সত্যই নিজের আদর্শ নহে। দলের মোহ ক্রমে অসত্যকে প্রশ্রয় দেয়, বাঁধা বুলি আবৃত্তি করিয়া সত্যকে বাধাগ্রস্ত করিতে থাকে, সফলতা মাত্রকেই বাহিরের দিক দিয়া পাইবার চেষ্টায় সত্যকে খর্ব করে।

অভিজিৎ বুঝিয়াছিলেন যে সংখ্যাবাহুল্য অথবা আয়তন-বিশালতার দ্বারা সত্যের মূল্য নির্দ্ধারণ হইতে পারে না, তিনি জানিতেন যে বিন্দুপরিমাণ সত্যের মূল্যও অসীম, তাই তিনি বারংবার বলিয়াছেন নিজের অন্তরের মধ্যে যে সত্যবোধ তাহাকেই জাগ্রত কর, অন্যের মুখের দিকে তাকাইও না, বাহিরের সফলতার দিকে তাকাইও না। বিশ্বজিৎ যখন জানাইলেন— "তোমার শিবতরাইয়ের ভক্তদল যে তোমার কাজে হাত দেবার জন্যে অপেক্ষা ক'রে আছে, তাদের ডাক্‌বে না?" অভিজিৎ বলিলেন—"যে ডাক আমি শুনেছি সেই ডাক যদি তারাও শুন্‌ত তবে আমার জন্যে অপেক্ষা কর্‌ত না। আমার ডাকে তারা পথ ভুল্‌বে।"

নিজের সম্বন্ধে যুবরাজের মনে কিন্তু কখনও সন্দেহ মাত্র হয় নাই, প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত তাঁহার সংকল্প স্থির, তাঁহার বিশ্বাস অচঞ্চল। অম্বাকে বলিলেন, সুমন যে পথে গিয়াছে তিনি নিজেও সেইপথেই যাইবেন। অম্বা বলিল—"যখন তার দেখা পাবে, বোলো মা তার জন্যে পথ চেয়ে আছে।" পরিপূর্ণ ভরসায় যুবরাজ শুধু একটি কথা বলিলেন—"বল্‌ব।" যাইবার সময়ে বিশ্বজিৎ যখন বড়ই ব্যাকুল হইয়া বলিলেন—"কেবল একটি আশ্বাসের কথা বলে যাও যে, আবার মিলন ঘট্‌বে।" অকম্পিত চিত্তে যুবরাজ উত্তর দিলেন—"তোমার সঙ্গে আমার বিচ্ছেদ হবার নয় এই কথাটি মনে রেখো।" হৃদয়ে অপরিমিতা শান্তি লইয়া যুবরাজ চলিয়া গেলেন।

কুমার সঞ্জয় মুক্তধারার নিকটেও অভিজিতের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন, কিন্তু অভিজিৎ কুমারকে আর অগ্রসর হইতে দিলেন না, একা চলিয়া গেলেন। সমস্ত দুঃখ সমস্ত পাপের সম্মুখে যেন একাই দাঁড়াইতে চাহিলেন।

"দুঃখেরে দেখেছি নিত্য, পাপেরে দেখেছি নানা ছলে ;
অশান্তির ঘূর্ণি দেখি জীবনের স্রোতে পলে পলে ;
মৃত্যু করে লুকাচুরি
সমস্ত পৃথিবী জুড়ি।
ভেসে যায় তা'রা স'রে যায়
জীবনেরে ক'রে যায়
ক্ষণিক বিদ্রূপ।
আজ দেখ তাহাদের অভ্রভেদী বিরাট স্বরূপ!
তা'র পরে দাঁড়াও সম্মুখে,
বল অকম্পিত বুকে,—
'তোরে নাহি করি ভয়,
এ সংসারে প্রতিদিন তোরে করিয়াছি জয়।
তোর চেয়ে আমি সত্য এ বিশ্বাসে প্রাণ দিব, দেখ!
শান্তি সত্য, শিব সত্য, সত্য সেই চিরন্তন এক!"

যুবরাজ অভিজিৎ জীবনের চরম মূল্য দিয়া সমস্ত মানুষের জন্য পথ মোচন করিয়া দিলেন, নিজের প্রাণ উৎসর্গ করিয়া ভৈরবকে জাগাইলেন।[১]

এইরূপ করিয়াই ভৈরবের জাগরণ হয়। স্বার্থের বন্ধনে জর্জর হইয়া, রিপুর আঘাতে আহত হইয়া মানুষ যখন প্রত্যেক পাশের লোককে আঘাত করে ও আঘাত পায়—সেই প্রত্যেক আমির ক্রন্দনধ্বনি ভয়ানক বিশ্বযজ্ঞের মধ্যে সকল মানুষের প্রার্থনারূপে প্রলয়-নৃত্যে গর্জন করিয়া উঠে।

"মরণের গান
উঠেচে ধ্বনিয়া পথে নবজীবনের অভিসারে
ঘোর অন্ধকারে—

১। মে মাসের Modern Review পত্রিকায় "মুক্তধারার" ইংরেজি অনুবাদের পরিশিষ্টে রবীন্দ্রনাথ নিজে লিখিয়াছেন—"I must ask my readers to treat it as a representation of a concrete fact of psychology" এবং যুবরাজ অভিজিৎই যে নাটকখানির প্রধান পাত্র এরূপ আভাস দিয়াছেন। এইজন্যই এতক্ষণ আমরা যুবরাজ অভিজিতের কথা আলোচনা করিয়াছি। "মুক্তধারা" নাটকখানির মধ্যে অবশ্য অন্যান্য অনেক কথা আছে, সুবিধা হইলে পরে সে সম্বন্ধে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

যত দুঃখ পৃথিবীর, যত পাপ, যত অমঙ্গল
যত অশ্রুজল,—
যত হিংসা হলাহল
সমস্ত উঠেচে তরঙ্গিয়া
কূল উল্লঙ্ঘিয়া,
ঊর্দ্ধ আকাশেরে ব্যঙ্গ করি।"

মানুষ বলে, "জাগো, ভৈরব জাগো! কঠিন আঘাতে সকল আঘাতকে নিরস্ত কর। সমস্ত বিশ্বের পাপ হৃদয়ে হৃদয়ে ঘরে ঘরে দেশে দেশে পুঞ্জীভূত—তুমি আজ সেই পাপ মার্জনা কর!"

সঞ্চিত বিশ্বপাপ যখন বিকটমূর্তি ধারণ করে, প্রেমিকের আত্মনিবেদনে ভৈরব তখন জাগিয়া উঠেন।

"স্বার্থের সমাপ্তি অপঘাতে। অকস্মাৎ
পরিপূর্ণ স্ফীতিমাঝে দারুণ আঘাতে
বিদীর্ণ বিকীর্ণ ক'রি চূর্ণ করে তা'রে
কাল-ঝঞ্ঝাঝঙ্কারিত দুর্যোগ-আঁধারে।
একের স্পর্দ্ধারে কভু নাহি দেয় স্থান
দীর্ঘকাল নিখিলের বিরাট্ বিধান।"

যে জাতি আপন শক্তি ও ধনসম্পদকেই সর্বাপেক্ষা শ্রেয় জ্ঞানে জাতীয় অহমিকাকে প্রচণ্ড করিয়া তুলিয়াছে, প্রলয়-মুহূর্তে তাহার সেই উদ্ধত ঐশ্বর্য্যের বিদীর্ণ প্রাচীর ভেদ করিয়া রুদ্রের মার্জনা নামিয়া আসে—

"গর্জ্জমান বজ্রাগ্নিশিখায়
সূর্য্যাস্তের প্রলয়লিখায়
রক্তের বর্ষণে,
অকস্মাৎ সংঘাতের ঘর্ষণে ঘর্ষণে।"

যে জাতি আপন শক্তি ও সম্পদকে অবিশ্বাস করিয়া জড়তা, দৈন্য ও অপমানের মধ্যে নির্জীব অসাড় হইয়া পড়িয়াছে, দুর্ভিক্ষ ও মারী, প্রবলের অবিচার, আঘাতের পর আঘাতের দ্বারা তাহাকে অস্থিমজ্জার কম্পান্বিত করিয়া ভৈরবের আবির্ভাব হয়। অন্ধকার রাত্রে রুদ্রের-রথচক্রের বজ্রগর্জনে মেদিনী বলির পশুর হৃৎপিণ্ডের মত কাঁপিয়া উঠে—প্রলয়দাহের রুদ্র-আলোকে স্তূপাকার

পাপের দহনদীপ্তিতে ভৈরব আপনাকে প্রকাশ করেন।[১] সমস্ত বন্ধন ভাসিয়া যায়, চলাচলের পথ জুড়িয়া বাজিতে থাকে—

জয় ভৈরব জয় শঙ্কর
জয় জয় জয় প্রলয়ঙ্কর !

১। উদ্ধৃত অংশগুলি বলাকা (পৃঃ ৪৫, ৯৬, ৯৭, ১১৬, ১১৭), চিত্রা ("এবার ফিরাও মোরে", পৃঃ ১৯), গীতালি (পৃঃ ৫০) ও নৈবেদ্য (পৃঃ ৬৫, ৭৪) হইতে এবং অন্য কতকগুলি অংশ শান্তিনিকেতনী, ১৭শ খণ্ড, ("মা মা হিংসী", পৃঃ ৪৭ ও "পাপের মার্জনা" পৃঃ ৫৭-৫৯), ধর্ম ("দুঃখ", পৃঃ ১০৮) হইতে সামান্য পরিবর্তন করিয়া লওয়া হইয়াছে।